অদ্বৈত মল্লবর্মণ—এক ‘জাউলার পোলা’র নাম

স্বপন মুখোপাধ্যায়

অদ্বৈত মল্লবর্মণের আত্মজৈবনিক উপন্যাস ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ বাংলা উপন্যাসের ধারায় একটি জলবিভাজিকা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য। ‘জাউলার পোলা’ অর্থাৎ মালোপিতার সন্তান অদ্বৈত স্বগোত্রের অবহেলিত শ্রমজীবী মানুষদের জীবনযন্ত্রণা নিজের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন। এই উপলব্ধ সত্যের সুন্দর রূপ ‘তিতা[illegible] নদীর নাম’। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ বা সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’-র সঙ্গে তিতাসের পার্থক্য এখানে। অদ্বৈতের নিজের কথায়—‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড়ো artist, master artist কিন্তু বাওনের পো। রোমান্টিক। আর আমি তো জাউলার পোলা।’

অদ্বৈত ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কাছে গোকর্ণঘাট গ্রামে মালোপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম অধরচন্দ্র মল্লবর্মণ। তাঁর মাতার নাম জানা যায় না। তিনি অদ্বৈতের উপন্যাস তিতাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনন্তের মায়ের মতই দুঃখিনী অবগুণ্ঠিতা নারী। মাইনর স্কুলে ক্লাসে প্রথম-হওয়া ছাত্রটি ম্যাট্রিকেও প্রথম-বিভাগে পাশ করেন। উচ্চশিক্ষালাভের প্রতি গভীর আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে সহপাঠী ও শিক্ষকদের সহযোগিতা অদ্বৈতকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হতে উৎসাহিত করে। প্রথম বর্ষের পাঠ দারিদ্র্যের চরম আঘাতকে উপেক্ষা করেও অব্যাহত ছিল কিন্তু জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর পথেও এমন বাধা নেমে এল যে অদ্বৈতকে চিরদিনের মতো উচ্চশিক্ষা লাভের দূরাকাঙ্খা থেকে সরে আসতে হল।

প্রথাগত শিক্ষার আঙ্গিনায় ঠাঁই না পেলেও কলকাতায় চলে আসেন। এখানে পার্কসার্কাস থেকে প্রকাশিত হত ‘নবশক্তি’ পত্রিকা। সম্পাদক, প্রেমেন্দ্র মিত্র। ‘নবশক্তি’ পত্রিকার সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব নেন অদ্বৈত। প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাটির সম্পাদনার সব দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন। ছোটবেলা থেকেই কাজের প্রতি ঐকান্তিকতা তাঁকে সকলের প্রিয় করে তুলত। সেই শ্রমকুণ্ঠাহীন ঐকান্তিকতা যুবক অদ্বৈতকে পত্রিকার কাজে অপরিহার্য করে তুলল। ১৯৩৮ সালে তিনিই হলেন পত্রিকাটির সম্পাদক। কিন্তু অচিরেই পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে অদ্বৈত মাসিক ‘মোহাম্মদী’ পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯৪৪ সালে এই পত্রিকাটিতেই ধারাবাহিকভাবে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ প্রকাশিত হতে থাকে। হঠাৎই এই পত্রিকা ছাড়তে হয়। সেই সঙ্গে তিতাস প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৫ সালে অদ্বৈত ‘দেশ’ পত্রিকায় যোগদান করেন।

স্বভাবভীরু, আত্মমগ্ন, নম্র, লাজুক প্রকৃতির মানুষটি একান্তে অনলস ভাবে আপন কাজে মগ্ন থাকতেন আর অবসর কাটতো জ্ঞানান্বেষণে শ্রমসাধ্য বিচিত্র-বিস্তৃত পথে, মূলত পল্লিজীবনের প্রান্তিকজনদের জীবনের সন্ধানে। কখনো পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, দর্শন, কখনো শিল্প-

সংস্কৃতি আবার কখনো চলমান জগতের অমৃতগরলের সন্ধানে অদ্বৈত নিশিদিন পরিশ্রম করতেন। এদিকে উপার্জনলব্ধ সামান্য অর্থ অনেকটাই বই কিনতে চলে যেত, বাকিটুকু দিয়ে যে মুষ্টিঅন্ন জোগাড় করতেন তাও ভাগ করে নিতেন অভাবী, প্রত্যাশী আপনজনদের সঙ্গে। নিজে ছিলেন অকৃতদার কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে ছিন্ন মূল মানুষের স্রোত যখন কলকাতার বুকে আছড়ে পড়েছে তখন আপনপর বিচার না করে যতখানি পেরেছেন নিঃস্ব, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। অনিবার্য ফল কালান্তক রোগ। বাণী সাধনার মধ্যে নিমগ্ন অদ্বৈত দ্রুত জীবনসুধা পান করতে গিয়ে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত ক্ষয়িষ্ণু শরীরের কাছে নিজেকে নিভৃতে সঁপে দিতে বাধ্য হয়েছেন। জীবনদীপ নিভে গেছে মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে ১৯৫১ সালে।

নদী আর নৌকা, জেলে আর মাছ, ক্ষুধা আর দারিদ্র্য এসবের সঙ্গে আবাল নিবিড় সম্পর্ক অদ্বৈতের। বাল্যবন্ধু রেবতীমোহন দেবনাথ এবং চন্দ্রদয়াল বর্মণের সঙ্গে তিতাসের বুকে জেলে-নৌকায় কেটেছে দিনের পর দিন। শুধু অ্যাড্‌ভেঞ্চার নয়, মৎসজীবী দরিদ্র মানুষদের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে, তাদের দৈনন্দিন অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করবার তাগিদে অদ্বৈতের এই নৌকাবিহার। ছোটবেলা থেকেই লোকজীবনের নৈর্ব্যক্তিক দলিল নির্মাণে প্রয়াসী অদ্বৈত সর্বদাই সঙ্গে রাখতেন নোটবুক এবং পেনসিল। পেনসিলের আখরে ধরা থাকতো মালোজীবনের অকথিত কাহিনী। সেই মূলধন এবং কৌমস্মৃতি আপন চিত্তে ও মননে জারিত করে লেখা হল 'তিতাস একটি নদীর নাম'। ব্যক্তিজীবনে অদ্বৈত সর্বদাই দুঃখী মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সাহায্যের চেষ্টা করেছেন। এই সৃজনশীল কথাশিল্পীর সংবেদনশীল হৃদয় মানুষের জন্য সহমর্মী চেতনায় আর্দ্র ছিল তাই বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরীখে যখন তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কথাশিল্প 'তিতাস একটি নদীর নাম' রচনা করেন তখন কাহিনীর চরিত্রগুলি এমন জীবন্ত হয়ে উঠে পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে যায়।

সমাজের অবহেলিত প্রান্তিকজনের কথা সাহিত্যের প্রদীপ্ত অঙ্গনে তুলে ধরার জন্য হতদরিদ্র মানুষদের কাছাকাছি থেকে তাদের জানার চেষ্টার ফসল ১৯৩৬-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ, 'এ দেশের ভিখারী সম্প্রদায়'। ভিখারীদের অজানিত জীবনকথার অনুপুঙ্খ চিত্রায়ণ প্রমাণ করে অদ্বৈতের নৈর্ব্যক্তিক জীবনান্বেষণ কত গভীর ও মর্মস্পর্শী। ১৯৪৮ সালে সোনার তরী পত্রিকার শারদসংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'শাদা হাওয়া'। অদ্বৈত নানা প্রবন্ধে পল্লিজীবনের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা বৈশিষ্ট্য গবেষকের নিষ্ঠা নিয়ে প্রকাশ করতে থাকেন। পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকরতা অদ্বৈতের অন্তরাত্মাকে অস্থির ও উদ্বেল করেছে আর তার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সমকালীন গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে।

১৯৪৪-৪৫ সালে তিতাস মোহাম্মদী পত্রিকায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় শ্রাবণ থেকে মাঘ সংখ্যায়। তবে মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কয়েক কিস্তি প্রকাশিত হয়ে 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। বলা হয় পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। তবে অনেকে মনে করেন পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায়নি। যখন উপন্যাসটি

প্রকাশিত হচ্ছে তখন অদ্বৈত মোহাম্মদী-তে কাজ করেন কিন্তু শেষের দিকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধের ফলে তাঁকে মোহাম্মদীর চাকরি ছাড়তে হয়। এই ঘটনার সঙ্গে পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়ার সম্পর্ক থাকতে পারে। উপন্যাসটি আর না ছাপার অছিলা হিসেবে প্রচার করা হতে পারে যে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। ঘটনা যাই ঘটুক পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য অদ্বৈত উপন্যাসটির বড় রকমের পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেন। দেশ পত্রিকায় কাজ করবার সময় পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পী ভিন্‌সেন্ট ভ্যান গগ্‌-এর উপর রচিত আর্ভিংস্টোনের জীবনী গ্রন্থ Lust for life-এর অনুবাদ 'জীবনতৃষ্ণা' দেশ পত্রিকায় ধারবাহিকভাবে ১৯ মার্চ ১৯৪৯ থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল। এই সময় একদিন ধরা পড়ে অদ্বৈত তখনকার দিনে ভয়াবহ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। নিজের অসুস্থতা ও রোগ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন কিন্তু অন্যের কাছে তিনি তা গোপন রেখেছিলেন। তাঁর দেশ-পত্রিকার সহকর্মীদের কাছ থেকে জানা যায় অদ্বৈত এমনিতেই মুখচোরা ছিলেন তার উপরে রোগ-সম্পর্কে সচেতন হয়ে তিনি একবারেই নিজেকে অপরদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতেন। কারো সঙ্গে তেমন মিশতেন না। দেশ পত্রিকার অফিসের কাজের পর তিনি তিতাস পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য একনিষ্ঠভাবে প্রতিটি শব্দ ও বাক্য প্রয়োজন মার্জনা করতেন। কিন্তু যক্ষ্মার ভয়ংকর আক্রমণ তাঁকে কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে যেতে বাধ্য করে। তিতাসের পরিমার্জনা শেষ হয়ে এসেছে। এই পরিমার্জিত তিতাসের পাণ্ডুলিপি অদ্বৈত বামপন্থী-লেখকদের পৃষ্ঠপোষক প্রকাশনা সংস্থা 'পুঁথিঘর'-এর হাতে তুলে দেন। অদ্বৈতের জীবৎকালে তিতাস বই হয়ে প্রকাশিত হয়নি। মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ১৯৫৬ সালে 'তিতাস একটি নদীর নাম' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

তিতাসের বর্ষার জলস্রোতের মত সরল, সাবলীল ভাষা ও বাক্যবন্ধ 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের বড় সম্পদ। পল্লিবাংলার সজল-সবুজ রূপের মধ্যে কাহিনীর বিন্যাস পাঠকের হৃদয় অশ্রুসিক্ত করে তোলে। অথচ এ যেন কত স্বাভাবিক, পরিচিত ছবি। নারী হৃদয়ের চিরন্তন আকুতি তার সামাজিক বন্ধন ও আর্থিক অনটনের মধ্যেও কত সুন্দরভাবে চিত্রিত। অনন্তর মা কোন অজানিত কারণে আবেগে চঞ্চল হয়ে পাগলের এক ঝাঁকা চুলদাড়ির উপর মুঠামুঠা আবির মাখিয়ে দেয়।

সুব্‌লার বউ হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, 'এ কি করলা তুমি দিদি'। অনন্তর মা হাসিয়া বলিল, 'আইজকার দিনে সকলে সকলেরে রাঙাইছে। পাগলেরে ত কেউ রাঙাইল না ভইন। আমি একটু রাঙাইয়া দিলাম।'

'কেউ যদি দেখত?'

'তা হইলে কইতাম তারে, পাগলে আমারে পাগলিনী করছে।'

'মস্করা রাখ দিদি। কোন্‌দিন তোমারে ধইরা পাগলে না জানি কি কইরা বসে আমি সেই চিন্তাই করি দিদি। কি কারণে পাগল হইছে সেই কথাখান ত তুমি জান না।'

'জানি গো জানি, মনের মানুষ হারাইয়া পাগল হইছে।'

'তুমি তো তারে মনের মানুষ মিলাইয়া দিতে পার না।'

'তা পারি না। তবে চেষ্টা কইরা দেখতে পারি, আমি নিজে তার মনের মানুষ হইতে পারি কিনা।'

'বসন্তে তোমার মন উতলা করছে দিদি। তোমার অখন একজন পুরুষ মানুষ দরকার।'

তিতাস রচনার মধ্যে অদ্বৈতের শ্রেণিচেতনা স্পষ্ট হলেও তিনি কৌলিক গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেকে সীমায়িত করে রাখেননি। তিতাস নিঃসন্দেহে মালোদের জীবনকাহিনী কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্বের সব মেহনতি মানুষ যারা সামন্ততান্ত্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শিকার তাদের জীবনের টানাপোড়েন সেই কাহিনীর মধ্যে বিধৃত। তাই তিতাস বিশেষ হয়েও নির্বিশেষ এবং আন্তর্জাতিক। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'ওল্ডম্যান এণ্ড দ্য সি' অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' বা সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' চরিত্র বৈশিষ্ট্যে তিতাসের সঙ্গে এখানেই সমগোত্রীয়।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর জীবৎকালেই সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকদের কাছ থেকে তাঁর সৃষ্টির জন্য প্রশংসা এবং স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষয়রোগের নির্মম আক্রমণে মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল বলে তিতাস যে পরবর্তীকালে বাংলাসাহিত্যের একটি মহাকাব্যিক সৃষ্টির সম্মান লাভ করে তা তিনি দেখে যেতে পারেননি। অর্ধাহারে বা অনাহারে দিন কাটিয়ে তিনি দধীচির অস্থি দিয়ে তিতাস গড়ে ছিলেন। বিশ্বাস ছিল বাংলার পাঠক এই জীবন-নিংড়ানো ধনের কদর একদিন ঠিক বুঝতে পারবে। বাস্তবে সে প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়নি। বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের দুই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, ঋত্বিক ঘটক এবং উৎপল দত্ত তিতাসের মধ্যে বাংলার সঞ্চারমান লোকজীবনের বলিষ্ঠ ও সার্থক রূপারোপ প্রত্যক্ষ করে উপস্থাপিত করলেন নাটক, 'তিতাস একটি নদীর নাম'। দুটি প্রযোজনাই দর্শকের আবেগে আপ্লুত এবং প্রশংসায় ধন্য হয়েছে। ঋত্বিকের ছবি প্রথম প্রদর্শিত হয় বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে বাণিজ্যিক প্রেক্ষাগৃহে। কলকাতাতে ১৯৮৩ সালে প্রথম প্রদর্শিত হয়। বাণিজ্যিক ভাবে চলচ্চিত্রটি যদিও কোথাও সফলতা পায়নি।

১৯৯২ সালে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কল্পনা বর্ধন পেঙ্গুইন ইন্ডিয়া থেকে প্রকাশ করেন তিতাসের ইংরেজি অনুবাদ A river called Titas। অনেক দেরিতে হলেও তিতাস আন্তর্জাতিক পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন কল্পনা বর্ধন।

'তিতাস একটি নদীর নাম' আজ একটি চিরায়ত সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে সমাদৃত। ব্রাত্যজনের সুখদুখের কাহিনী তাদের মুখের ভাষাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আঞ্চলিক উপভাষায় পাঠকের কাছে তুলে ধরবার মুন্‌শিয়ানা ছিল অদ্বৈত মল্লবর্মণের। লোক সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য তিনি যখন প্রবন্ধ রচনা করতেন তখন তিনি যে ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছেন সেই রসদ তিতাসের মালো পরিবারের চালচিত্র অঙ্কনে সহায়ক হয়েছে। উপন্যাসের চরিত্র বিন্যাস যে বিশাল ক্যানভাসের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে আছে তার নানা রং-এর মধ্যে ব্রাত্যজনের

ভাষা সম্পদ কারো দৃষ্টির আড়ালে থাকে না। মালোদের ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গি দুটোতেই অদ্বৈত সাবলীল ও বিশ্বাসযোগ্য। মালো জীবনের কোনো খণ্ডচিত্র নয় এক পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন উপন্যাসটির মধ্যে প্রোথিত হয়ে আছে। মালো সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বাগ্‌ধারাগুলি উপন্যাসের আরেক সম্পদ। তাদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, হতাশা-ক্রোধ বোঝাবার জন্য তুলে আনা এমন সহজ সরল অথচ ব্যঞ্জনায় সুদূরপ্রসারী বাগ্‌ধারাগুলির যথাযথ ব্যবহার পরিস্থিতি ও মানুষগুলিকে একবারে পাঠকের চোখের সামনে উপস্থিত করে।

বাসন্তী বা অনন্তের মার কাহিনি কেবল মালো সমাজের ইতিবৃত্ত নয়, বিশ্বের সমস্ত নারী হৃদয়ের গহন রহস্যের অন্তর্গত এই কাহিনি। তাই তিতাস অদ্বৈতের এক চিরায়ত শিল্পসৃষ্টি।

অমৃতলাল পাড়ই সম্পাদিত 'গ্রামোন্নয়ন কথা' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।